যে সব শিল্প এ দেশে ছিলনা



যে সব শিল্প এদেশে ছিল না

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

স্বাধীনতা দিবস : ১৩৬২

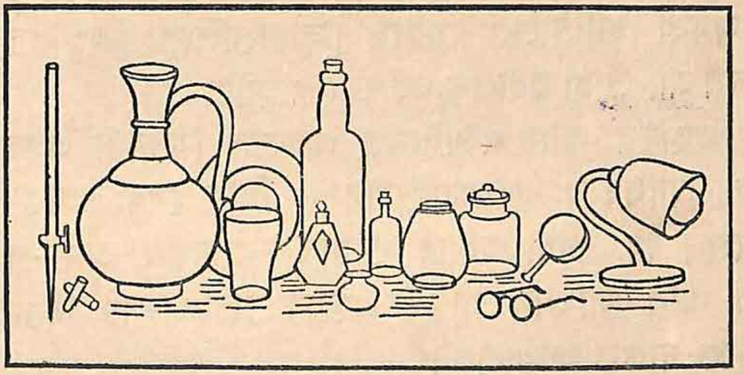
মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র

৬৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯, হইতে শ্রীঅশোককুমার বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং
৩৩-এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬, অন্নপূর্ণা প্রেস হইতে
শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

যে সব শিল্প এদেশে ছিল না

কাচ

চারি বছরের দুরন্ত ছেলে স্বপনকে লইয়া বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। গত তিন দিনের মধ্যে সে একটা ঘড়ির কাচ, একটা দোয়াত, একটা শিশি, একটা গ্লাস ও একখানি আয়না ভাঙ্গিয়াছে। ভাঙ্গা কাচের গ্লাসে ত হাত কাটিয়া রক্তারক্তি!



তাহার মায়ের ভয়—কে নাকি বলিয়াছে, কাচে হাত কাটিলে উহা হইতে ধনুষ্টঙ্কার হওয়াও বিচিত্র নয়।

ভাবিতেছি, স্বপনকে বাঁধিয়া রাখিব—না বাড়ী হইতে সমস্ত কাচের জিনিস দূর করিয়া ফেলিয়া দিব।

কিন্তু সারাদিন একটি দামাল শিশুকে বাঁধিয়া রাখা কি সহজ কথা? বরং কাচগুলিকেই সরাইয়া ফেলা ভালো।

তাহাই বা কি করিয়া হইবে ? থার্মোমিটার, ঘড়ি, শিশি-বোতল, জানালা ও আলমারির কাচ, আলোর চিম্‌নি, চশমা —এগুলির কি উপায় করা যায় ? দেখা যাইতেছে, কাচ জিনিসটা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের মধ্যে এমনভাবে আসিয়া গিয়াছে যে, ইহাকে আর আমরা কোনক্রমেই বাদ দিতে পারি না। অথচ বিপদও ইহা হইতে কম নয় ! ঠুন্ করিয়া কাচে একটু ঘা লাগিলেই অমনি সহস্রখান !—কাচের প্রত্যেক টুক্‌রাখানিতে আবার ক্ষুরের মতন ধার। আর ঐ টুক্‌রাগুলি এমনি স্বচ্ছ যে সব সময়ে উহা দেখাও যায় না।

কাচ জিনিসটা যদি এমন হইত যে, উহা ফেলিলে ভাঙ্গিবে না, অথবা ভাঙ্গিলেও তাহার টুক্‌রাগুলিতে কিছুমাত্র ধার থাকিবে না, তাহা হইলে খুবই ভালো হইত।

বহুদিন আগে ভেনিসের একজন বিজ্ঞানী এমন কাচ নাকি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার রাজা দেখিলেন যে, তাহা হইলে তাঁহার দরবারের ঝাড়-লণ্ঠনের কদর আর থাকিবে না। এইজন্য তিনি সেই বিজ্ঞানীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন !

কাচ আবিষ্কারের একটি গল্পও আছে। 'সিডেন'-এর কয়েকজন ব্যবসায়ী একবার একটা প্রকাণ্ড বালুকাময় চড়ার উপর উঠিয়া সেখানে রান্না করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু রান্না করিতে হইলে উনান চাই। সেখানে উনান কোথায় পাইবে ? অগত্যা কতকগুলি চক্‌চকে বালি উনানের মত করিয়া তাহার উপর হাঁড়ি চাপাইয়া দিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! খানিক পরেই দেখা গেল, সেই উনানের কতক অংশ একটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিসে পরিণত হইয়াছে। সেগুলি স্বচ্ছ এবং শক্ত!

ব্যবসায়ী নাবিকেরা এই ব্যাপারটি খুব গোপন রাখিল এবং মাত্র ভূমধ্যসাগরের (মেডিটারেনিয়ানের) উপকূল হইতে স্পেন পর্যন্ত এই অজানা বস্তুর প্রচলন হইল।

কিন্তু ইটালি ধীরে ধীরে এই গোপন বিষয় জানিয়া ফেলিল এবং কালক্রমে 'ভেনিস' কাচ তৈয়ারির একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ভেনিসের কাচ সমগ্র জগৎকে একদিন চমৎকৃত করিয়াছিল।

আরও প্রায় একশত বছর কাচ তৈয়ারি কৌশলটি ভেনিসিয়ান্‌রা খুব গোপন করিয়া রাখিল। এইভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দী কিংবা তাহারও অধিককাল কাচ তৈয়ারির প্রণালী বিশ্বের অপরাপর দেশের নিকট অজ্ঞাত রহিল।

কিন্তু 'বোহেমিয়ান্' এবং ইংরাজের নিকট কাচ তৈয়ারির ঐ যাদুমন্ত্র বেশীদিন গোপন রহিল না। প্রণালীটি তাহারা নিজেরাই আবিষ্কার করিয়া আরও ভালো কাচ তৈয়ারির করিতে আরম্ভ করিল। ফলে ভেনিসের ব্যবসায়ে সে প্রতিপত্তি আর থাকিল না।

'ফিনিসিয়ান্‌রা' কাচ প্রস্তুতের দ্রব্যাদির সহিত 'ম্যাঙ্গানিজ' নামক পদার্থ মিশাইয়া কাচের একটা নূতন ধারা আনিলেও ইহাতে বুদ্‌বুদ উঠা, মধ্যে মধ্যে কালো দাগ বা আঁশ আঁশ থাকা বন্ধ হইল না। এইজন্য ঐ সময়কার কাচ-নির্মাতারা

নানারূপ সুন্দর সুন্দর ফুলদানি প্রভৃতি তৈয়ারি করিলেও গ্লাস কি জানালার পরিষ্কার কাচ তখনও নির্মিত হয় নি।

বহুকাল পরে (১৬১০—১৬১৬) পটাশ নামক পদার্থ এবং সীসা কাচ-প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কাচের ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় সময় এইজন্য যে, ফ্লিন্ট (flint) কাচ (যাহা স্বচ্ছতার জন্য সমাদৃত ও মূল্যবান) এই সময় হইতেই কয়লার আগুনে এবং সীসা দেওয়া বদ্ধপাত্রে তৈয়ারি হইত।

দুইজন জার্মান বৈজ্ঞানিক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'জেনা' (jena) কাচ আবিষ্কার করেন। ইহাই এখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতির কাজে এবং চশমার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীদের নিকট এই কাচ ব্যারিয়াম্ (barium) কাচ বলিয়া পরিচিত।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্তও কাচ হাতে তৈয়ারি হইত। তারপর হইতে 'অটোমেটিক্' বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে কাচ তৈয়ারি হইয়া থাকে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, ভারতবাসীরা যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্বেই কাচ তৈয়ারি করিতে পারিত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে কোনও বিদেশী পণ্ডিত (Pliny) ভারতীয় কাচকে উচ্চ শ্রেণীর কাচ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণ কাচের বাসন এবং কাচের চুড়ি ঐ সময়ে ভারতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া বর্তমান ভূ-তত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে শিশি ও চুড়ি তৈয়ারির স্থায়ী কারখানাও ছিল।

অতি পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—'কাচখণ্ডকে মণি বলিয়া ভুল করিও না' অথবা 'কাচ এবং মণি কি একই রকম আদর পায়?'—ইত্যাদি। ইহা হইতে মনে করা যায় যে, কাচের প্রচলন তখন এদেশে ছিল এবং তাহার দামও ছিল খুব কম।

কাচের কোনও পাত্রে অম্ল বা যাহাই রাখা যাউক না কেন, তাহা নষ্ট হয় না। তাহার কারণ কাচ, পিতল-কাঁসা বা এ্যালুমিনিয়ামের মত কোনও ধাতু নয়। কাজেই ইহার কোন ধাতব ক্রিয়াও নাই।

কাচ ধাতু নয়। রসায়ন প্রকৃতির কতকগুলি পদার্থ যেমন, সিলিকা (বোরিক ও ফস্‌ফোরিক এ্যাসিড) প্রভৃতি,—সোডা, পটাশ লাইম (চুণ), ম্যাগ্‌নেশিয়া, জিঙ্ক অক্সাইড, লেড অক্সাইড ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে মিশাইয়া আগুনের উত্তাপে তরল করিয়া লওয়া হয়। এই তরল পদার্থটি চঞ্চল—উহা এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে না। প্রয়োজন অনুসারে ছাঁচে ফেলিয়া ইহা হইতে জিনিস তৈয়ারি করিতে হইবে।

কতখানি উত্তাপ দিলে কাচ গলিয়া যাইবে তাহার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। উত্তাপের সহিত কাচ ক্রমে নরম হইয়া আসে, আবার ঠাণ্ডা পাইলে উহা ক্রমে শক্ত হয়। আটার মত নরম কাচকে হাত দিয়া বা ছাঁচে ফেলিয়া বিভিন্ন আকারে উহা রূপান্তরিত করা হয়। কাচের ফাঁপা কোনও জিনিস তরল কাচ হইতে ফুঁ দিয়াও তৈয়ারি করা যায়।

কাচ খুব মসৃণ ও স্বচ্ছ। অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে কাচকে অস্বচ্ছও করা যাইতে পারে। কাচকে ইচ্ছামত নানাবিধ রংয়েরও করা চলে।

তৈয়ারি করিবার প্রণালী অনুসারে কাচকে প্রধানত চারি রকমে ধরা হয় ;—ব্লোন্ (blown) কাচ, প্লেট (plate) কাচ, সিট্ বা পাত কাচ এবং টেবল কাচ।

কিন্তু উপাদান অনুসারেও কাচকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যেমন,—

(ক) বোতলের কাচ—বালি, লাইম এবং এ্যালুমিনিয়াম দিয়া তৈয়ারি। ইহাকে সাধারণ কাচও বলা হয়।

(খ) ক্রাউন কাচ—বালি, লাইম এবং সোডা।

(গ) বোরো-সিলিকেট ক্রাউন কাচ—বোরিক এ্যাসিড এবং সিলিয়া।

(ঘ) বোহেমিয়ান্ বা শক্ত কাচ—বালি অথবা পাথরের কুচি, লাইম এবং পটাশ দিয়া তৈয়ারি। ইহা সহজে গলে না।

(ঙ) ফ্লিণ্ট অথবা পটাশ লেড কাচ—বালি ও পটাশসহ সীসা দিয়া তৈয়ারি। ইহাকে ফরাসী দেশে স্বচ্ছ কাচও বলে। ফ্লিণ্ট কাচ খুব সহজে গলে। সেইজন্য ইহা দ্বারা জিনিসপত্র তৈয়ারি করাও কতকটা সহজ।

(চ) সোডা লাইম কাচ—সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সিলিকেট দিয়া তৈয়ারি।

অল্প উত্তাপেই এই কাচ গলে। ফুঁ দিয়া অথবা হাত দিয়া ইহা দ্বারা জিনিসপত্র তৈয়ারি করা যায়। এই কাচ খুব সস্তা ;

কিন্তু সস্তা হইলেও মূল্যবান কাচের মত ইহা হইতে খুব স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন অবস্থা পাওয়া যাইতে পারে। এই কাচ দিয়াই কাচের জানালা প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। তখন ইহাকে ক্রাউন কাচ (খ) বলে।

(ছ) কাট্ বা বেলোয়ারী কাচ—বেলোয়ারী কাচের চুড়ি আমরা সকলেই জানি। বিদেশীরা এই চুড়ি আমাদের দেশে রপ্তানি করিয়া একদিন বহু সহস্র টাকা লইয়া গিয়াছে। সেই সময়ে দেশভক্ত মুকুন্দ দাস গাহিয়াছিলেন—

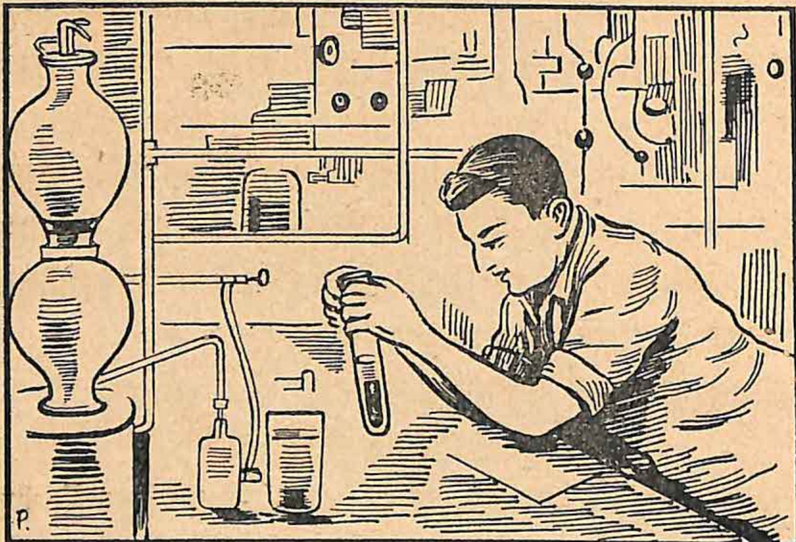
"ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি, বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।"

এই চুড়ি সাধারণত 'ফ্লিণ্ট' কাচ দিয়াই তৈয়ারি হয়। ভাঙ্গা রঙীন কাচের চুড়ি উত্তাপ দিয়া বাঁকাইয়া কেমন সুন্দর শিকল তৈয়ারি হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন।

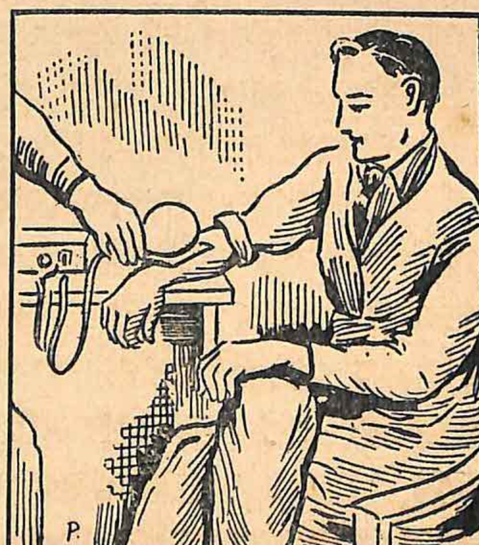
অস্বচ্ছ, ঘোলাটে অথবা রঙীন কাচ তৈয়ারি করিতে বিভিন্ন ব্যবস্থার দরকার হয় না।

ব্লোন্ কাচে (তরল অবস্থায়) ফুঁ দিয়া কাচের কুঁজো তৈয়ারি হয়। বড় বড় আয়না, জানালার কাচ প্রভৃতিকে 'প্লেট' কাচ বলে। ইহারই একটা অংশকে আবার ক্রাউন কাচ বলা হয়। উচ্চ শ্রেণীর শিশি-বোতল সাধারণ কাচ দিয়া তৈয়ারি না করিয়া ফ্লিণ্ট কাচ দিয়া তৈয়ারি করা হয়। বিদ্যুতের 'বাল্‌ব্'এর জন্য 'বোরো সিলিকেট' ক্রাউন কাচ প্রয়োজন। বাজারে যে সব নকল মুক্তার মালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই ফ্লিণ্ট অথবা বোরো সিলিকেট কাচ দিয়া তৈয়ারি।

যে সব কাচের অনন্যসাধারণ উত্তাপ সহ্য করিবার



ক্ষমতা আছে, তাহা দিয়া বাতি কি গ্যাস বার্ণারের চিম্‌নি তৈয়ারি হয়। যে সব কাচের রসায়ন-ক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট বেশী সেগুলি দিয়া 'টেষ্ট টিউব', ফ্লাস্ক প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। থার্মোমিটার যে কাচ দিয়া তৈয়ারি হয় তাহা আলাদা এক শ্রেণীর কাচ এবং কেবল ঐজন্যই উহা ব্যবহৃত হয়।



রঙীন কাচ—লাল, নীল প্রভৃতি রং মিশাইয়া কাচকে রঙীন করা হয় না। ইহা রাসায়নিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণত উত্তাপ দেওয়ার পূর্বে কাঁচা মাল-মশলার সঙ্গে উহা মিশাইয়া দেওয়া হয়।

কালো রং করিতে—কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রন অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

নীল রং করিতে—কোবাল্ট অক্সাইড, পটাশিয়াম ডিক্রোমেট এবং কপার অক্সাইডের ব্যবহার দেখা যায়।

হলুদ রং হইতে বেগুনী—নিকেল অক্সাইড, মেটে বা কটা রং করিতে—নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ অথবা আয়রন অক্সাইড মিশাইয়া তৈয়ারি হয়।

সবুজ রং করিতে—আয়রন কম্পাউণ্ড।

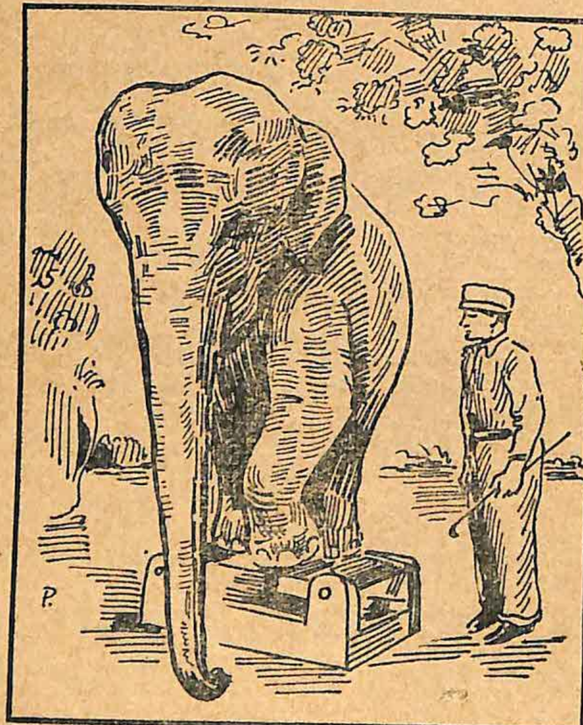
লাল রং করিতে—সেলেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম, সালফাইড এবং কপার দিয়া বা না দিয়া।

কাচ হইতে কোন কিছুর দাগ তুলিতে হইলে 'আর্সেনিক' ম্যাঙ্গানিজ, ডায়ক্সাইড, নিকেল অক্সাইড, সেলেনিয়াম, নাইটার ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

ইংরাজের শাসনকালে ভারতে বিদেশ হইতে প্রায় এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার কাচ আমদানি হইত। ভারতে সাধারণত বালি, চুণ এবং সোডা দিয়া কাচ তৈয়ারি হয়। এই কাচকে 'সোডা লাইম' কাচ বলে। ভারতে কাচ তৈয়ারির মোট খরচের শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ যায় সোডার দামে। এই সোডা বিদেশ হইতে আসে এবং এদেশে প্রায় দেড়গুণ দামে

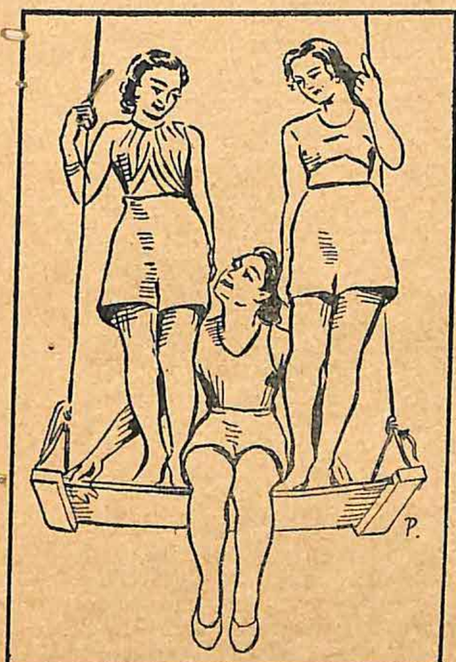
বিক্রয় হয়। ভারতের সাধারণ বালিতে লোহার ভাগই বেশী থাকে বলিয়া ভারতে তৈয়ারি কাচে দাগ না থাকিয়া যায় না। কাচ রং করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার প্রায় সমস্তটাই এই দেশে পাওয়া যায়।

অভঙ্গুর কাচ—কাচ তৈয়ারির সাধারণ প্রণালী এই যে, তরল অবস্থায় ইহাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করিতে হয়।



এই প্রণালীকে ইংরাজীতে এ্যানিলিং (annealing) বলে। শক্ত কাচ তৈয়ারি করিতে হইলে প্রায় ১৫00 ডিগ্রী (ফাঃ হিঃ) উত্তাপে জিনিসগুলি গালাইয়া তারপর বাতাসের সাহায্যে অথবা

৪০০ ডিগ্রী (ফাঃ হিঃ) তেলের মধ্যে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। ইহার ফলে ঐ কাচের বাহিরের পর্দাটি খুব শীঘ্র জমাট বাঁধিয়া যায় এবং ভিতরের অংশটি ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া আসিবার ফলে উপরের ঐ শক্ত পর্দাটির সঙ্গে আঁটিয়া যায়। এই শ্রেণীর কাচ সহজে ভাঙে না।





আমরা যেমন মাটি, পিতল বা এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে রান্না করি, আধুনিক 'বোরো সিলিকেট' কাচের হাঁড়িতেও তেমনি রান্না করা চলে। এই হাঁড়িগুলি আগুনে ফাটে না এবং উহা হইতে কোনরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াও হয় না।

একপ্রকার 'টেম্পার্ড' কাচ তৈয়ারি হইয়াছে। এই কাচে ইট-পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেও ভাঙ্গিবে না।

বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার কাচের সাহায্যেই সম্ভব হইতেছে। এক্স-রে, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণের যন্ত্র, অতসী কাচ—সব-কিছুর জন্যই কাচের প্রয়োজন।

অদৃশ্য কাচ—সাধারণ কাচের উপর উজ্জ্বল আলো পড়িলে উহা ফিরিয়া (reflect) আসে। এইজন্য কাচের ভিতরকার ছবি অনেক সময় ভালো দেখা যায় না। রৌদ্র বা তীব্র বৈদ্যুতিক আলো কাচের উপর পড়িলে এইরূপ ঘটে। চোখে চশমা দিয়া ফটো তুলিতে গেলেও কখনও কখনও চশমার কাচ 'রিফ্লেক্ট' করে বলিয়া ফটো খারাপ হইয়া যায়। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য একপ্রকার অদৃশ্য কাচ আবিষ্কৃত হইয়াছে।



ছবিতে দেখা যাইবে, উহার মধ্যস্থলের অংশটিতে অদৃশ্য কাচ। পার্থক্য দেখাইবার জন্য উপর-নীচে সাধারণ কাচও দেওয়া হইয়াছে।

কাচের উপর নক্সা আঁকা—যে পাত্রের উপর নক্সা করিতে হইবে পূর্ব হইতে ঐ পাত্রটি তরল মোমের মধ্যে ডুবাইয়া লইতে

হইবে। পাত্রটিকে উপরে তুলিলে বাতাসে অল্প সময়ের মধ্যেই মোমগুলি উহার গায়ে শক্ত হইয়া আঁটিয়া যাইবে।

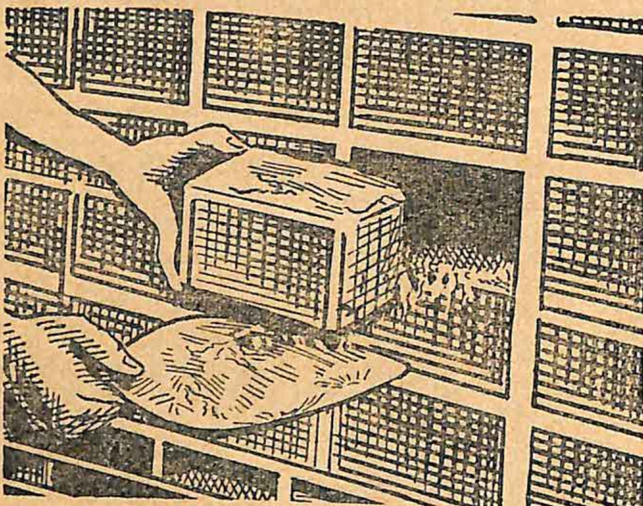
এইবার ছুরি কি লোহার শলাকা দিয়া পাত্রের গায়ে নক্সা তোলা দরকার। নক্সা কাটা হইলে ঐ পাত্রটিকে এবার হাইড্রোফ্লুওরিক (hydrofluoric) এ্যাসিডের পাত্রের মধ্যে ডুবাইতে হইবে। এই এ্যাসিড কাচের গায়ে লাগিলে কাচকে



ক্ষয় করিয়া দেয়। নক্সার ফাঁকে ফাঁকে এ্যাসিড ঢুকিয়া কাচকে ঠিক নক্সার আকারে ক্ষয় করে, আর অন্যান্য অংশ মোমে ঢাকা থাকে। তারপর এ্যাসিড হইতে পাত্রটি তুলিয়া মোমের আবরণটি উঠাইয়া দিলেই কাচ-পাত্রটির গায়ে সুন্দর নক্সা দেখা দিবে।

কাচের সুতা—দুই রকমের নূতন কাচ তৈয়ারি হইতেছে—একটি কাচ হইতে সুতার মত আঁশ এবং অপরটি চোখের

'লেন্‌স'-এর কাচ। সিল্কের মত চক্‌চকে কাচের আঁশগুলি দিয়া কাপড় বোনা চলিতে পারে। অবশ্য সুতাগুলির প্রধান কাজ কাপড় তৈয়ারি নয়—ঐগুলি দিয়া উত্তাপ রক্ষা, শব্দ প্রতিরোধ বা বৈদ্যুতিক তার মোড়া (insulation) হয়। শন,



পাট, কাপাস প্রভৃতি উদ্ভিদজাত সুতা যেমন সহজেই ভিজিয়া যায়, কাচের সূতা সেরূপ যায় না। ইহা খুব টেকসইও হয়। ইহাতে কখনও 'মরচে' পড়ে না এবং ইহাতে আগুনও ধরে না।

কাচের এতখানি উন্নতিসাধন করিয়াও বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন, 'There much remains to be done'—অর্থাৎ কাচ সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু করিবার আছে।*

*এই প্রবন্ধটি লিখিতে অধ্যাপক মিত্রের 'Chemistry', 'Scientific American' নামে মাসিক, কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হইতে প্রকাশিত 'Glass Industry' এবং 'Glimpses of Industrial Britain' নামক পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

রবার

বর্তমান যুগে রবারকে আমরা আমাদের অবশ্য নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে গণ্য করিতে পারি। কিন্তু ষাট বছর পূর্বে হয়ত কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, এই রবার আমাদের এত প্রয়োজনে আসিতে পারে। প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করিতে গেলে ইহাকে বর্তমান সভ্যতার অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ছেলেমেয়েদের খেলনা, গাড়ীর টায়ার-টিউব, ওয়াটার-প্রুফ, ব্যায়ামের নানাবিধ সামগ্রী, এমন কি, জুতা পর্যন্ত এই রবার হইতে প্রস্তুত হইতেছে। আর এই রবারের সাহায্যেই আমরা বিজলী তার নিরাপদে নাড়া-চাড়া করিতে পারি। এমন আরও অসংখ্য বস্তু এই রবার দ্বারা তৈয়ারি হইতেছে।

সব কিছুরই প্রথম আবিষ্কারের একটা গৌরব আছে। সে হিসাবে স্পেনবাসীদেরই রবার আবিষ্কারের গৌরব প্রাপ্য। তাঁহারাই প্রথমে মেক্সিকোতে গিয়া তথাকার অধিবাসীদের একপ্রকার কাল রংয়ের বল্ লইয়া খেলিতে দেখেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, বল্‌টি মাটিতে পড়িবামাত্র লাফাইয়া উঠে। তখনই তাঁহাদের মনে জাগিল—বল্‌টি লাফাইয়া উঠিল কেন? আর সেই 'কেন'র মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহারা কৌতূহলী হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন,—বল্‌টি কোন্ কোন্ উপাদানে তৈয়ারি। মেক্সিকোবাসীদের কাছে খবর লইয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বল্‌টি ulaqunadil নামক

গাছের আটা হইতে তৈয়ারি। জিনিসটা তাঁহাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই মনে হইল। তাই তাঁহারা এই গাছের খানিকটা আটা ইউরোপে লইয়া যান—যদিও উহা তখন বিশেষ কোন কাজে আসে নাই। ইহার পরে ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে Lacondamine অবিশুদ্ধ (crude) আটা ইউরোপে লইয়া যান। কিন্তু তখনও ইহার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। পরে Pristley নামক জনৈক রসায়নবিদ্ পণ্ডিত রবারের পেন্সিলের দাগ তুলিবার গুণ আবিষ্কার করেন। আর তখন হইতেই রবারের নাম হয় 'রাবার'।

তখন পর্যন্ত রবারকে কেহ প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে গণ্য করিতে পারে নাই—কেননা তখনও ইহাকে ব্যবহারিক জীবনে অপরিহার্য বস্তু বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে নাই। তাই বাজারে ইহার মূল্য ছিল না বলিলেই হয়। ইহার পর ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ রবারের জল-শোষণ নিরোধ করিবার গুণ উদ্ভাবন করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ইহার মূল্য বাড়িয়া গেল। সাধারণ (raw) রবার—যাহা প্রথমত সংগৃহীত হয়, তাহাতে বিশেষ কোন কাজ হয় না। তাই ইহাকে শক্ত করিবার প্রয়োজন-বোধ হইল। কিন্তু শক্ত করিয়া দেখা গেল যে, ইহার স্বাভাবিক ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের একটা চিন্তার বিষয় হইল—কি করিয়া রবারকে উহার স্বাভাবিক ধর্ম রক্ষা করিয়া কাজে লাগাইতে পারা যায়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে Good Year নামক একজন আমেরিকান ও Hanock নামক একজন ইংরাজ

একসঙ্গে vulcanize করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন—যার ফলে রবারের স্বাভাবিক ধর্ম রক্ষা হয় এবং ইহাকে কার্যকরী বস্তু হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

প্রথমত যে রবার সংগৃহীত হইত, তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের ছিল। তাহা ছাড়া, একমাত্র মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যজাত বৃক্ষ হইতে ইহা পাওয়া যাইত। তাই সংগ্রহও হইত কম। আমাজন নদীর উপত্যকায় এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মায়—যাহা হইতে বাজারের শ্রেষ্ঠ রবার প্যারা (Para) পাওয়া যায়। সিংহল ও মালয় দ্বীপেও আজকাল এই জাতীয় বৃক্ষের ভাল চাষ হইতেছে। 'Ule' জাতীয় রবার মধ্য আমেরিকা ও ব্রিটিশ হণ্ডুরাস্ (Honduras)-এ জন্মায়—মেক্সিকোতেও প্রচুর জন্মায়। ইহার রং কাল ও অপরিষ্কৃত—তাই বাজারে ইহার মূল্য কম। ব্রেজিলে সিয়ারা (ceara) নামক একজাতীয় রবার প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। আমাদের ভারতবর্ষের আসামে রংবং (Rambang) জাতীয় বৃক্ষ হইতে যে রবার পাওয়া যায়, তাহাই 'ইণ্ডিয়া রবার' বলিয়া পরিচিত। এই জাতীয়



রবার অশিক্ষিত মজুরদের দ্বারা সংগ্রহ করায় ইহা খুব পরিষ্কার রাখা যায় না। তাই প্যারা-রবার হইতে ইহার মূল্য কম। ইহা ছাড়া আফ্রিকায় সাগোস (Sagos) জাতীয় রবার পাওয়া যায় এবং অন্যান্য লতাজাতীয় গাছ হইতেও কিছু কিছু রবার সংগৃহীত হয়।

আমাজন নদীর উপত্যকা হইতে কি করিয়া প্যারা-জাতীয় রবারের ব্রিটিশ উপনিবেশে চাষ করা হয়, তাহা এক বিস্ময়কর ঘটনা। Sir Henry Wickham নানাবিধ উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করিতে ব্রেজিলে যান। তথায় গিয়া ব্রিটিশ অধিকৃত গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহ ও তথাকার জলবায়ুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয়। তাই তিনি ব্রিটিশ অধিকৃত গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে রবারের বীজ রোপণ করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার এই মতলব কার্যে পরিণত করিতে অনেক বাধা-বিঘ্ন দেখা দিল। প্রথমত তথাকার অধিবাসিগণ বীজ দিতে অনিচ্ছুক ছিল; তাহা ছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তনে বীজের উর্বরাশক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত ব্রেজিল হইতে বীজ আনিয়া রোপণ করিতে সময়ও লাগিত প্রচুর। তাই অনেক কিছু ভাবিয়া স্যার হেন্‌রি ব্রেজিল হইতে বীজ আনিয়া উহা ইংলণ্ডের কিউ (Kew) উদ্যানের ডিরেক্টরকে দেন এবং সেখান হইতে চারাগাছ তৈয়ারি করিয়া ভারতে পাঠান। কিন্তু ভারত সরকার নূতন স্কীমে (পরীক্ষায়) অর্থব্যয় করিতে রাজী না হওয়ায় উহা সিংহলের বোটানিক্যাল গার্ডেনে পাঠানো হয়। ফল হইল, ভারত দুর্ভাগ্যক্রমে এই

লাভজনক রবার-চাষ হইতে বঞ্চিত হইল, আর সিংহল ইহা হইতে লাভবান হইতে লাগিল।

এখন এই রবার আমরা কি উপায়ে পাইতে পারি তাহাই বলিতেছি। সাধারণত গাছ যখন ৫।৬ বছরের হয় তখন হইতেই রবার সংগ্রহের নিয়ম। গাছের গোড়া হইতে ৫।৬ ফুট উঁচুতে রবার গাছ কাটিয়া (tapping) তবে রস নিষ্কাশন করিতে হয়। এইভাবে কাটিবার নানাবিধ উপায় আছে। এই রস সংগ্রহ-প্রণালী অনেকটা আমাদের দেশে খেজুর রস সংগ্রহের মত। গাছের চারিদিকে 'V'এর আকারে কাটিয়া একপ্রকারে রস সংগ্রহ করা হয়। আর এক উপায়ে খাড়াভাবে কতকগুলি খাঁজ কাটিয়া কোণাকুণিভাবে খাঁজের শেষে একটি পাত্রে রবার সংগৃহীত হয়। এই পদ্ধতিটির নাম 'হেরিং বোন সিষ্টেম' (Herring bone system)। আর এক প্রণালীতে রস পাওয়া যায়—ইহাকে 'স্পাইরাল সিষ্টেম' (Spiral system) বলে। এই উপায়ে গাছের গুঁড়িটির সমস্ত অংশ হইতে রস পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত উপায়ে দুধের মত সাদা তরল পদার্থ (latex) পাওয়া যায়। এই latex ও বৃক্ষের রস (sap) এক পদার্থ নয়—সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস।

রবার বৃক্ষ হইতে রস (latex) সংগ্রহের পর উহার সহিত 'এসেটিক এ্যাসিড' বা 'লাইম জুস্' মিশাইলে উহা স্পঞ্জের আকার ধারণ করে। তারপর উহাকে অঙ্গার পাত্রে ঢালিয়া কেকের আকার দেওয়া হয়। এই অবস্থাকে বিস্কিট (Biscuit) বলা হয়। এই বিস্কিটকে ধৌত ও শুষ্ক করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

অংশে কাটিয়া 'রোলারে' পিষিয়া সীট্ (sheet) রিবন (ribbon) আকারে পরিবর্তিত করিবার পর আবার বায়ুশূন্য শুষ্কক



যন্ত্রে (Vacuum drier) সম্পূর্ণরূপে জলশূন্য করিয়া তবে চালান দেওয়া হয়।

রবারের চাষ বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। ছোট ছোট রবারের চারাগুলি ১৫।২০ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। অবশ্য চারা লাগাইবার পূর্বে জমিটিকে জলশূন্য করিতে হইবে। চারা একবার মাটিতে ভালভাবে লাগিয়া গেলে জমিটিকে আগাছাশূন্য করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করিবার দরকার হয় না।

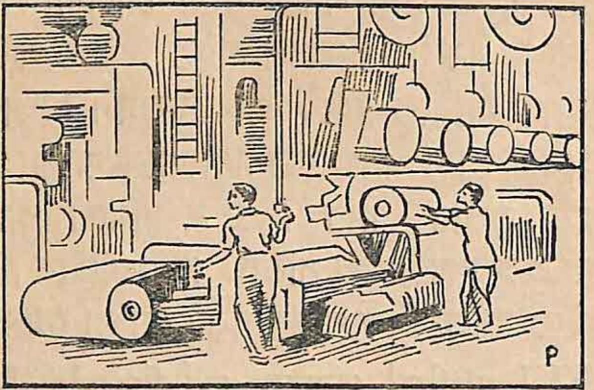


এই গেল বৃক্ষজাত রবারের কথা। তাহা ছাড়া রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানাগারে একপ্রকার কৃত্রিম রবার উদ্ভাবন করিয়াছেন —যাহা বৃক্ষজাত রবার হইতে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই জাতীয় রবারকে 'থিওকোল' (Thiokol) বলা হয়। ইহা Olefin এবং Poly-sulphides নামক

পদার্থদ্বয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। Poly-sulphides তৈয়ারি হয় কষ্টিক সোডা ও সালফার-এর সংমিশ্রণে। প্রথম সংমিশ্রণের পর পলিসালফাইড আর একটি পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তারপর উহাতে এথিলিন ডিকলোরাইড মিশ্রিত করিতে হয়। কতটুকু মিশ্রিত করিতে হইবে এবং কতক্ষণ মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা অবশ্য জনসাধারণকে জানানো হয় না। এই মিশ্রণকে তৃতীয় পাত্রে (vat) রাখিলে পাত্রের নিম্নে হলুদ রংয়ের একপ্রকার পলি পড়িতে দেখা যাইবে। তারপর এই পলি হইতে ময়লা নিষ্কাশনের পর যে গুঁড়া (dust) পাওয়া যাইবে, তাহাতে methyl orange solution মিশ্রিত করিয়া ঐ কমলালেবুর রংটা পাটকিলে (pink) রংয়ে পরিণত হইলে উহাতে 'হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড' মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। তখন এই তরল পদার্থটি একটা হলুদ আটায় (gum) পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে উহাকে জড়াইয়া উহার ভিতরকার জলটাকে নিংড়াইয়া ফেলিতে হয়। এই প্রকার কৃত্রিম উপায়ে আমরা রবার পাইতে পারি।

এই কৃত্রিম (Synthetic) রবারের বিশেষ গুণ এই যে, ইহা কোন তৈলে, এ্যাসিডে অথবা যে-কোন তরল পদার্থে বিকৃত হয় না ; অথবা জলবায়ু, সূর্যতাপ প্রভৃতির তারতম্যের ফলেও সহজে ইহার কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু স্বাভাবিক রবারের এই সমস্ত গুণ না থাকায় আমাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বাভাবিক রবারের প্রসার-শক্তি (tensible strength) ৪৫০০ পাউণ্ড, আর এই

থিওকোলের প্রসার-শক্তি ১৩00 পাউণ্ড। কিন্তু গ্যাসোলিন, তৈল বা অনুরূপ জিনিসে স্বাভাবিক রবার মিশ্রিত করিলে



উহার প্রসার-শক্তি ৫00-তে আসিয়া দাঁড়ায়! থিওকোলের কিন্তু এই অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তনই হইতে দেখা যায় না।



কোনও মূল্যবান গাছে যখন ফোঁকর দেখা যায়, তখন ঐ ফোঁকরটি বেশ পরিষ্কার করিয়া উহার ভিতর আলকাতরা মাখাইয়া দেওয়া হয়। তারপর ফোঁকরের ঐ গর্ত জায়গায় বেশ করিয়া রবার জড়াইয়া পরে বাফার (buffer) নামক একপ্রকার যন্ত্র দিয়া ঐ রবারের ফিতার দাগগুলিকে সমান করিয়া দেওয়া হয়। তখন ঐ জায়গাটি দূর হইতে সিমেণ্ট লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে

বলিয়া বোধ হয়। এইভাবে রবারের 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধিয়া দেওয়ার পর দেখা যায়, গাছটির বাড়িতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই এবং ভিতরের গর্তটিও কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও রবারের প্রয়োজনীয়তা সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে।

রাঙ বা টিন

টিনের বা রাঙের খনি বন্ধ হইয়া গেলে যত অসুবিধা ঘটাইবে, জগতের সমস্ত সোনা-রূপার খনির কাজ বন্ধ হইয়া গেলেও আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার তত ক্ষতি হইবে না। অবশ্য সাধারণের নিকট ইহা আজ নগণ্য ও কমদামী জিনিস। প্রাচীনকালের ধাতুবিদ্‌গণও (metallurgists) টিনকে খুব উচ্চ স্থান দেন নাই; এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ টিনকে 'ধাতুর মধ্যে শয়তান' (Devil among metals) আখ্যা দিতেও ত্রুটি করেন নাই! কেবল প্রাচীনকালেই বা কেন, এখনও ঘণ্টার কর্কশ ঠং ঠং শব্দকে 'টিনি' (Tinny) এবং ঘণ্টার সুরের আওয়াজকে 'রূপালী' (Silvery) বলা হয়। অথচ ঘণ্টার শব্দ যেরূপই হউক না কেন, উহা তামা ও টিনের মিশ্রণে তৈয়ারি—রূপার নামগন্ধও তাহাতে নাই।

টিন দেখিতে কতকটা রূপার মত ; কিন্তু টিনের প্রাচুর্য বেশী বলিয়া সস্তাও খুব। টিন কখনও অবিমিশ্রভাবে একা আসে না, অন্যান্য ধাতুর সহিত ইহা পাওয়া যায়। বহুকাল ধরিয়া বলিভিয়াতে রূপার খনির সহিত যখন টিনও উঠিত, তখন সেগুলি বাজে জিনিস বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। মাত্র গত শতাব্দী হইতে ইহার প্রয়োজনীয়তা জানা গিয়াছে।

যুদ্ধের কাজে অন্যান্য জিনিসের মত টিনেরও প্রয়োজন দেখা গিয়াছে। পূর্বে যোদ্ধাদের বিশেষ কোনও জায়গায় আসিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে হইত। ইহাতে তাহাদের অসুবিধা হইত যথেষ্ট। এইজন্য নেপোলিয়ন এমন একটি হাল্‌কা পাত খুঁজিতেছিলেন যাহার ভিতর করিয়া সহজেই খাদ্যাদি লওয়া চলে। এইজন্য তিনি বারো হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। টিনের কোটা এই সময়ে আবিষ্কৃত না হইলেও ঐ ধরনের একটা কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা—এ চিন্তা তখন হইতেই বিজ্ঞানীদের মাথায় খেলিতেছিল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে টমাস্ কেন্ শেট্ নামক একজন ইংরাজ টিনের পাত্রের প্রথম প্রচলন করেন; কিন্তু অন্যান্য ধাতুকে রক্ষা করিবার উপায় বহু পূর্ব হইতেই লোকের জানা ছিল। ১২৪০ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোহেমিয়া, স্যাক্সনি প্রভৃতি স্থানে এইজন্য টিনের পাতের ব্যবহার ছিল বলিয়া জানা যায়।

টিনের পাত তৈয়ারি করা খুব কঠিন নয়। ইস্পাতের খুব পাতলা পাত গলিত টিনের মধ্যে ডুবাইয়া লইলেই টিনের পাত হয়। এইজন্য টিনের ঘর, টিনের কোটা, টিনের বাক্স

প্রভৃতি কথা ভুল। কারণ, ঐ পাতগুলি বাস্তবিক পক্ষে ইস্পাতের—টিন দিয়া কেবল উহা কোটিং করা থাকে মাত্র। কিন্তু এইরূপ ইস্পাতের পাতে গলিত টিনের সামান্য এক পোচ লাগানোর জন্যই প্রতি বৎসর প্রচুর টাকা খরচ হইয়া থাকে।

টিনের পাত্রে আমরা ঘি, মাখন, গুঁড়া দুধ প্রভৃতি রাখি। কোথাও কোন কিছু পাঠাইতে, বাস্ প্রভৃতির 'বডি' তৈয়ারি করিতে টিন ব্যবহার করা হয়। টিন দিয়া ঘর বাঁধিয়াও আমরা বাস করি। আমাদের সংবাদপত্র, মাসিক পত্র এবং বই প্রভৃতি যে ধাতুর তৈয়ারী অক্ষরে মুদ্রিত হয়, সেগুলি টিনের রং (alloy) করা। রেডিও প্রভৃতিকে ঝক্‌ঝকে করিতে টিনের প্রয়োজন হয়। সাবানের বাক্স, ক্রীমের কোটা, এমন কি, দাঁত বাঁধাইতে পর্যন্ত টিনের প্রয়োজন দেখা যায়।

প্রস্তর যুগের পর আসে তাম্র যুগ; কিন্তু এই ধাতুটি এতই নরম যে, ইহাদের দ্বারা শিকার করিবার অস্ত্রশস্ত্রও হইল না, কিংবা চাষের যন্ত্রপাতিও হইল না। এইভাবে প্রায় হাজার বছর চলিয়া গেল। তারপর আবিষ্কৃত হইল নূতন একটি ধাতু। গলিত তামার সহিত টিন মিশাইয়া এই ধাতু তৈয়ারি হইল। ইহার নাম ব্রঞ্জ।

কাজেই তাম্র যুগের পরবর্তী যুগকে ব্রঞ্জ যুগও বলা যাইতে পারে। এই সময়ে ব্রঞ্জ-নির্মিত অনেক মূর্তি তৈয়ারি হইয়াছে।

টিনকে কয়লার মত বিশেষ কোন কোন জায়গায় খনির মধ্যে পাওয়া যায় না। এই ধাতু অন্য ধাতুর সহিত মিশিয়া থাকে।

তারপর ব্রঞ্জের জায়গায় লৌহ আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীনকালে ফিনিসিয়ান্‌দের টিন ব্যবসায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহারা তাহাদের জানাশুনা সমস্ত দেশে বাণিজ্য জাহাজ পাঠাইত। বৃটেনের সঙ্গেও অনেকদিন পর্যন্ত তাহাদের টিনের ব্যবসায় চলিয়াছে।

এক শত বছর পূর্বেও যুদ্ধাদিতে কামান প্রভৃতি যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র তৈয়ারি হইত, তাহা ব্রঞ্জ দিয়া তৈয়ারি। এখন অবশ্য সেগুলি ইস্পাত দিয়াই তৈয়ারি হইয়া থাকে। সঙ্গীতের যন্ত্রাদিতেও ব্রঞ্জের, তথা টিনের দান কম নয়। গলিত তামার সহিত টিন (প্রায় ৪ ভাগ তামা ও ১ ভাগ টিন) মিশাইলে যে ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহাকে কাঁসা বলা হয়। যখন ঘড়ির এত প্রচলন হয়নি, তখন ঘণ্টা শুনিয়াই অনেকে সময় ঠিক করিত। কাঁসা দিয়া এই ঘণ্টা বা বেল্ (Bell) তৈয়ারি হয়। এইজন্য ইংরাজীতে কাঁসার নাম হইয়াছে Bell metal।



ইংলণ্ডের মধ্যযুগে টিনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে যে একপ্রকার টিনের মুদ্রার প্রচলন ছিল, বিভিন্ন পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ী তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধের সময় ব্রঞ্জের মুদ্রা অনেক শাসক সম্প্রদায়কে বাঁচাইয়া দিয়াছে। 'মেডেল' প্রভৃতি তৈয়ারিতেও ব্রঞ্জের বিশেষ প্রয়োজন। রাশিয়ান্‌দের নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের কামান হইতে তৈয়ারী 'ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌'-এও টিনের দান কম নয়।

টিন উৎপাদনে এশিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমগ্র টিনের আঠার ভাগের তের ভাগই উৎপন্ন হয় এশিয়ায়। তাহা ছাড়া পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপ হইতে যথেষ্ট টিন পাওয়া যায়। সমস্ত পৃথিবীর টিনের মধ্যে ত্রিশ ভাগের এগার ভাগই মালয় উপদ্বীপ এবং ছয় ভাগের এক ভাগ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উৎপন্ন হয়। বাঙ্কা ও বিলিট (সিঙ্গাপুরের দক্ষিণে) নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে খুব বেশী টিন পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, থাইল্যাণ্ড, ফরাসী ইন্দোচীন, চীন এবং জাপানেও কিছু কিছু টিনের খনি দেখা যায়। ব্রহ্মদেশেও টিন জন্মে। দক্ষিণ আমেরিকার 'বোলেভিয়া' টিনের জন্য বিখ্যাত। টিন উৎপাদনে মালয় উপদ্বীপ প্রথম, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দ্বিতীয় এবং বোলেভিয়া পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

গত কয়েক বছরে ভারতে টিনের আমদানির হিসাব ঃ

১৯৪৮—৪৯	—	৬৬,৫৬৬ টন
১৯৪৯—৫০	—	৬১,৩৯৪ "
১৯৫০—৫১	—	৮৫,৭৯২ "

প্রধানত মালয় হইতেই এগুলি ভারতে আমদানি হয়। তাহা ছাড়া কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ

হইতেও টিন-মিশ্রিত ধাতু (Tin alloy) ও টিনের রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ আমদানি করা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে সিগারেটের টিন, বার্লির টিন, বিস্কুট ও দুধের কৌটা প্রভৃতি পরিশেষে আবর্জনায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। এগুলি হইতে 'বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া' বা 'ক্লোরিন্ গ্যাস' সাহায্যে ধাতব টিন উদ্ধার করা সম্ভব। এই পরিত্যক্ত টিনের পরিমাণ এদেশে প্রায় ১৫,000 টন। এগুলি হইতে অন্তত ৫00 টন টিন উদ্ধার করা সম্ভব। এজন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রয়োজন।

সেলুলয়েড

চিরুনি, সাবানের বাক্স, টুথব্রাশ এমন কি পেন্সিল বাড়িবার কল হইতে আরম্ভ করিয়া জুতা পরিবার 'জিব' পর্যন্ত আজকাল সেলুলয়েড দিয়া তৈয়ারি হইতেছে। জিনিসটি যেমন স্বচ্ছ, তেমনি সুন্দর। আবার এই সেলুলয়েডে ইচ্ছামত রঙ ধরানোও চলে।

কিন্তু কি করিয়া আস্তে আস্তে এই জিনিসটার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা হয়ত আমরা অনেকেই জানি না।

কোন্ জিনিস যে কোন্ প্রয়োজনে আবিষ্কৃত হয়, তাহা বুঝা শক্ত। এই সেলুলয়েড আবিষ্কারের গোড়ায় রহিয়াছে বিলিয়ার্ড খেলার প্রয়োজন। আগেকার দিনে সৌখিন এবং বড়লোকদের প্রিয় খেলা ছিল বিলিয়ার্ড। ইহাতে খরচও

হইত খুব। হাতীর মোটা দাঁত (আইভরী) হইতে এই খেলার জন্য বল্ তৈয়ারি হইত। কিন্তু প্রয়োজনীয় মোটা দাঁত ত সব সময়ে পাওয়া যায় না। কাজেই আর কিছু দিয়া ঐ রকম বল্ তৈয়ারির গুরুতর প্রয়োজন দেখা দিল। আমেরিকা হইতে এজন্য দশ হাজার ডলার (আমাদের দেশের প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা) পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, যে অন্য উপায়ে ঐ রকম বিলিয়ার্ড বল্ তৈয়ারি আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

জন্ হায়াট্ ছিলেন একজন আমেরিকান। ছাপাখানায় তিনি কম্পোজিটরের কাজ করিতেন। কথাটা তাঁহার মনে ধরিল। হায়াট্ ছাপাখানায় কাজ করেন, আর দিনরাত ভাবেন ঐ পুরস্কারের কথা। একদিন তাঁহার আঙ্গুল একটু কাটিয়া যায়। কোনও জায়গা কাটিয়া গেলে সেখানে কলোডিয়ন লাগাইলে ভাল হয়। হায়াট্ কলোডিয়নের শিশি খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, কে যেন ওষুধটা একেবারে সবখানি ঢালিয়া রাখিয়া দিয়াছে! তাঁহার খুব রাগ হইল। কিন্তু সব রাগ তাঁহার জল হইয়া গেল যখন তিনি দেখিলেন, ঐ কলোডিয়ন টেবিলের উপরে যেখানটায় পড়িয়াছিল, সেখানে উহা জমাট বাঁধিয়া জিলেটিনের মত হইয়া আছে! হায়াটের মাথায় হঠাৎ খেলিয়া গেল, এই কলোডিয়নের সঙ্গে তাহা হইলে হাতীর দাঁতের গুঁড়া মিশাইয়া বিলিয়ার্ড বল্ তৈয়ারি করা যায় কিনা!

বিলিয়ার্ড বল্ তৈয়ারী হইল; কিন্তু তাহা হইতে এক নূতন বিপদ দেখা দিল! উহার মধ্যে সেলুলোজ নাইট্রেট

থাকায় হঠাৎ একদিন বিলিয়ার্ডের টেবিলের কাছে ঐ বল একটা বোমার মত শব্দ করিয়া ফাটিয়া গেল! হায়াট্কে ভাবাইয়া তুলিল এই ব্যাপার।

এদিকে অন্য দেশেও ঐ বিলিয়ার্ড বল্ তৈয়ারি লইয়া আলোচনা যে না চলিতেছিল, এমন নয়। আলেকজাণ্ডার পার্কস্ নামক একজন ইংরাজ নাইট্রো-সেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর আর ক্যাষ্টর অয়েল মিশাইয়া নকল আইভরী তৈয়ারির চেষ্টা করিলেন। তাহা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের কথা। ইহার কয়েক বছর পরে ড্যানিয়েল স্পিল একটু উন্নত ধরনের নকল আইভরী তৈয়ারী করিলেন বটে, কিন্তু উহা নিখুঁত হইল না।

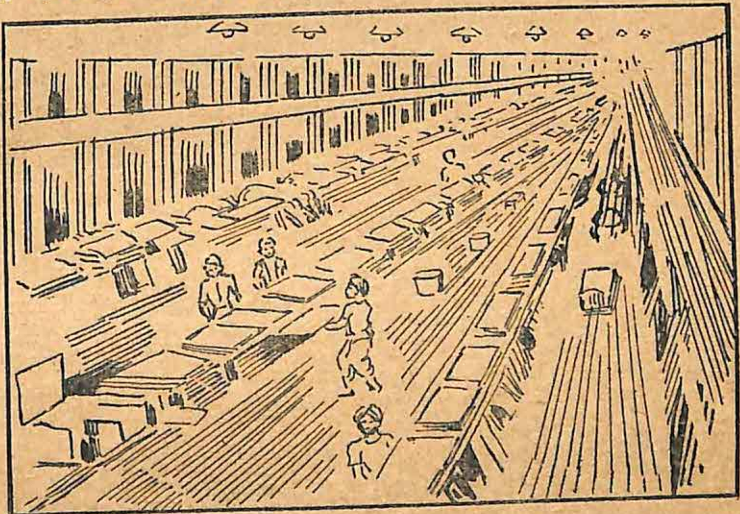
হায়াট্ এদিকে লক্ষ্য রাখিতেছিলেন, অন্যান্য দেশ ঐ আবিষ্কারের বিষয় কিভাবে চিন্তা করে। আলেকজাণ্ডারের কর্পূর মিশাইবার মতলবটা তাঁহার বেশ মনে ধরিল। তিনি নাইট্রো-সেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর মিশাইলেন। উহা হইল বেশ স্বচ্ছ। গরম করিলে উহা নরম হয়, তখন তাহা দিয়া যেমন খুশী জিনিসপত্র তৈয়ারি করা যাইতে পারে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এইজন্য নিউ ইয়র্কে একটি কারখানা খোলা হইল।

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র, এমন কি, আমাদের দেশেও এই সেলুলয়েডের কারখানা তৈয়ারি হইয়াছে। এই সেলুলয়েড লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া দেখা গেল, ইহাকে কাগজের মত পাতলাও করা যায়। ইহা হইতে ইষ্টম্যান সাহেব বায়স্কোপের ফিল্ম্ তৈয়ারী আবিষ্কার করিলেন।

কিন্তু এই সেলুলয়েডের সব চাইতে বড় অসুবিধা হইতেছে এই যে, ইহা আগুনে সহজে জ্বলিয়া উঠে। সেইজন্য ইহা হইতে কর্পূর বাদ দেওয়া যায় কিনা, বিজ্ঞানীরা সে বিষয় আলোচনা করিতেছেন।

প্লাসটিক

বর্তমান শতাব্দীতে প্লাসটিক নানা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। প্লাসটিকের টুথব্রাশ, প্লাসটিকের চিরুনি, প্লাসটিকের কলম, প্লাসটিকের খেলনা, চশমার ফ্রেম, আরো কত কি! তাহা ছাড়া ক্যামেরা, গ্রামোফোন, টেলিফোন,



বিদ্যুৎ ও মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি পর্যন্ত প্লাসটিকের! প্লাসটিকের পালিশ বাহির হইয়াছে। প্লাসটিকের চেয়ার, টেবিল, আলনা, আলমারি এমন কি ঘরবাড়ি পর্যন্ত তৈয়ারী হইয়াছে।

কী সুন্দর আর কত সস্তা এই প্লাসটিক! প্লাসটিকের তৈয়ারী জিনিস একাধারে সুন্দর, হাল্কা, মজবুত অথচ সস্তা। এজন্যই বিজ্ঞান আর শিল্প-জগতে আজ প্লাসটিকের এত আদর।

প্লাসটিক এমন একটি পদার্থ যাহা প্রয়োজন ক্ষেত্রে সহজেই নমনীয় এবং যাহাকে ইচ্ছানুযায়ী আকার দেওয়া যায়। প্লাসটিক বর্ণহীন, ইচ্ছানুযায়ী তাহাতে রঙ্‌ মিশাইয়া লওয়া হয়। কাচও স্বচ্ছ বটে, কিন্তু সহজে নমনীয় নয় এবং সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। গালাকে ইচ্ছানুযায়ী আকার দেওয়া গেলেও অল্প উত্তাপেই উহা নরম হইয়া উহার বিশেষ আকারটিকে নষ্ট করে। এইজন্য বাংলায় যথেষ্ট গালা উৎপন্ন হইলেও তাহা দিয়া হাতের কাঁকন আর গ্রামোফোন রেকর্ড ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু হয় না। সিমেণ্ট, প্যারিস প্লাস্‌টার প্রভৃতি সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এবং অস্বচ্ছ ও ওজনে ভারী বলিয়া সব কাজেই ঐগুলির ব্যবহার চলে না।

প্রত্যেক জিনিসই (matter) কতকগুলি কণা বা অণুর সংযোগে তৈয়ারী। কঠিন বস্তুর এই সংযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তখনই জিনিস ভাঙ্গে। প্লাসটিকের অণুগুলি এমন-ভাবে সংবদ্ধ করা হয় যে, সেগুলির একটি অপরটি হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

মাটি বা প্যারিস প্লাস্‌টারে জল মিশাইয়া ইহাকে বেশ নমনীয় করিয়া তাহা হইতে আমরা ইচ্ছানুরূপ আকারের জিনিস তৈয়ারি করিতে পারি। ধাতুর বেলায় উহা গালাইয়া লইয়া পরে আকার দেওয়া হয়।

প্লাসটিক যে সব উপাদানে তৈয়ারী সেই সব উপাদানের অণুগুলিকে সংবদ্ধ বা একতাবদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। ইহা দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) বিভিন্ন উপাদানের অণুর পরস্পর সংযোগ (কনডেনসেশন) এবং (২) একই পদার্থের একাধিক অণুর পরস্পর সংযোগ (পলিমেরিজেসন)।

এই সংহতি-ক্রিয়া উপাদান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করা হয়। প্রথমে প্রাথমিক উপাদান অর্থাৎ প্লাসটিক নির্মাণ করা, আবার কখনও বিবিধ উপাদানের মিশ্রণে পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাকে 'ফরমাল ডি হাইড' দ্রাবণে ডুবাইয়া সংহতি করা।

প্লাসটিকের সঙ্গে আরও কতকগুলি পদার্থ যথাসম্ভব সুক্ষ্ম চূর্ণের আকারে মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য রাখা হয়, ঐ চূর্ণ যেন মূল পদার্থের নমনীয়তা নষ্ট না করে।

রাসায়নিক 'রেজিন' মূল প্লাসটিক হিসাবে অন্যান্য পদার্থের ধারকস্বরূপ কাজ করে। এই মূল পদার্থটি সাধারণত শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত দিতে হয়। অবশিষ্ট উপাদান পরিপূরকমাত্র, তাহাদের কোন ধারক-শক্তি থাকে না। রঙ্ চূর্ণও একটি পরিপূরক পদার্থ।

পরিপূরক পদার্থগুলি আবার দুই রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। (১) সাধারণ চূর্ণ—যেমন, জীপসাম, খড়ি, অভ্র, ম্যাগনেসিয়া এবং (২) আঁশযুক্ত পরিপূরক—যেমন, এ্যাসবেষ্টস্, তুলার গুঁড়া, রেশমের অংশ ইত্যাদি।

পূর্বে বলা হইয়াছে, রাসায়নিক 'রেজিন' মূল প্লাসটিক হিসাবে অন্যান্য পদার্থের ধারক। কিন্তু এই রেজিন কি ?

ফরমাল ডি হাইড ও ফিনল একটি স্বর্শক্রিয় পদার্থের সঙ্গে কোন পাত্রে মিশ্রিত করা হয়। অল্পক্ষণ পরেই এই মিশ্রণ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ পরে এই মিশ্রণ হইতে ফাঁপা রবারের মত একটি নমনীয় পদার্থ বাহির হইয়া আসে; উহাই রেজিন। জল দিয়া ধুইয়া লইলে ইহা কাজের উপযোগী হয়।

বস্তু জগতের জিনিসগুলিকে (matter) আমরা প্লাসটিক আবিষ্কারের পূর্বে তিন রকমে দেখিতে পাই—(১) স্বাভাবিক; যেমন—কাঠ, ধাতু, পাথর প্রভৃতি; (২) কৃত্রিম; যেমন—কাচ, চীনামাটি, মৃৎপাত্র; (৩) আর সেই সব জিনিস যাহা আমরাই কোন পদার্থ হইতে কাজের জিনিসে রূপান্তরিত করি; যেমন—হাতীর দাঁত, শিং ইত্যাদি।

তারপর নূতন জিনিস প্লাসটিক আবিষ্কৃত হয়। ইহাকে দুই প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) উত্তাপ দিলে যাহা (মোমের মত) নরম হয়; যেমন—টুথব্রাশ, হ্যাণ্ডেল, ফাউণ্টেন পেন, গ্রামো-রেকর্ড এবং (২) উত্তাপ দিলে যাহা নরম হয় না; যেমন—প্লাসটিকের কাপ, গেলাস, ইলেক্‌ট্রিক সুইচ, টেলিফোন রিসিভার ইত্যাদি।

যে রাসায়নিক এই নূতন জিনিস (প্লাসটিক) আবিষ্কার করেন তাঁহাকে দেখিতে হয়—কিসে উহা শক্ত হয় অর্থাৎ জিনিসটির ক্ষুদ্র অণুগুলি দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হয়। এই কাজের জন্য সেলুলোজের দীর্ঘাকার কণা—অর্থাৎ কাঠ, তুলার আঁশ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছে।

বলা বাহুল্য, বস্তুমাত্রের অণুকে দুই রকমে দেখা গিয়াছে —ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ। উল্লিখিত দীর্ঘাকার সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশাইয়া তাহার মধ্যে কর্পূর এবং রেয়ন দিয়া সেলুলয়েড তৈয়ারি হইত।

যে পদার্থ সবজি-জগৎ হইতে আহৃত হয়, তাহাকেই সেলুলোজ বলা হয়। তুলা জাতীয় পদার্থ বা গাছের ছাল প্রভৃতি ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া ব্লিচিং পাউডার দিয়া এক রকম সাদা মণ্ড তৈয়ারি হয়। এই মণ্ড শুকাইলে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশাইলে সেলুলোজ নাইট্রেট হইবে। রেয়ন তৈয়ারি করিতে এই সেলুলোজ নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘ ও শক্ত আঁশযুক্ত আর একটি স্বাভাবিক জিনিস হইতেছে ক্যাসিন (casein)। দুধ হইতে ইহা তৈয়ারি হয়। দুধের মাখনটা তুলিয়া ফেলিলে 'রেনেট'এর সাহায্যে আগে ছানা তৈয়ারি করিতে হয়। এই ছানার টুক্‌রাগুলি সুক্ষ্ম হওয়া চাই। তারপর তাহা শুকাইয়া লইয়া তাহার সঙ্গে ইচ্ছানুযায়ী রঙ্‌ মিশাইতে হয়। ইহার সঙ্গে গ্লিসারিন বেনজাইন, অ্যালকোহল প্রভৃতি তরল দ্রাবক মিশাইয়া উহার নমনীয়তা বৃদ্ধি করা দরকার। তারপর উহাকে যন্ত্রমধ্যে চাপের সাহায্যে ইচ্ছানুরূপ আকার দিয়া পরে ফরমাল ডি হাইডএ-র মধ্যে ডুবাইয়া শক্ত করিয়া লওয়া হয়। ইহা হইতে ইলেট্রিক সুইচ, প্লাগ প্রভৃতি তৈয়ারি হইয়া থাকে।

এ্যালুমিনাম

গলির মুখে ঢুকিতেই শুনিলাম, আমাদের হাবুলচন্দ্রের পিসীমা এক বাসন-ওয়ালার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি হয়েছে?"

হাবুলচন্দ্রের পিসীমা একটি 'এ্যালুমিনামে'র ঘটি হাতে করিয়া বাক্‌যুদ্ধ করিতেছিল। আমার প্রশ্নে কতকটা আত্মস্থ হইয়া উত্তর করিল—"আমার এই এনামেলের ঘটি, কালীঘাট থেকে কেনা। তা' এখন একটু জল পড়ে। নগদ এক টাকা এগার আনা দিয়ে ঘাট কিনলাম, ও বলে কিনা এখন এর দাম তিন পয়সা!"

অগ্রসর হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ইহাই এ্যালুমিনামের পরিণতি! 'এনামেল' বলা সহজ বলিয়া অনেকের কাছে এ্যালুমিনাম-ও এনামেল নাম পাইয়াছে। 'এনামেল' কথাটির মানে ঝালাই-করা। লোহা, টিন বা তদনুরূপ ধাতুর উপর চীনামাটির মতন পদার্থ দিয়া যে কোটিং, আস্তরণ বা কলাই করিয়া দেওয়া হয়, উহাই এনামেল। কিন্তু 'এ্যালুমিনাম' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস।

ঠিক একশত বছর আগেও এই ধাতুটি ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও সোনার দরে ইহা বিক্রয় হইত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহার দাম ছিল প্রতি সের ৩২৭০৲ টাকা, চারি বছর পরে হয় ২০৫৲ টাকা এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহার দাম দাঁড়ায় প্রতি সের একশত টাকা!

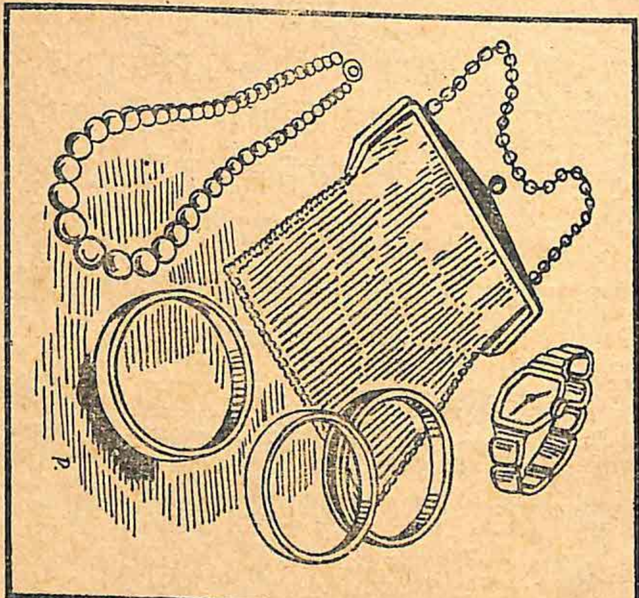
তৃতীয় নেপোলিয়নের রাজ-অতিথিদের জন্য এই এ্যালুমিনাম দিয়াই একদিন ডিস্, চামচ প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়াছিল! তখন রাজা-মহারাজারাই ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেন। দরিদ্রেরা দূর হইতে এ্যালুমিনামের কথা শুনিত বা ক্বচিৎ কেহ চক্ষে দেখিয়া জন্ম সার্থক মনে করিত।

এই ধাতুর আবিষ্কারক মার্কিন দেশীয় চার্ল্স্ মার্টিন্ হল্ এবং ফরাসী দেশীয় পল লুই তুঁস্যা। আবির্ভাবের পর ত্রিশটি বছর যাইতে না যাইতেই এ্যালুমিনাম তাহার স্বাতন্ত্র্যের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে দূর-দূরান্তের পল্লীগ্রামের অতি-বড় দরিদ্রের গৃহেও এ্যালুমিনাম তাহার আসন পাতিল।

অতি সাধারণ দোকানেও যুদ্ধের আগেও স্তূপাকারে এ্যালুমিনামের বাটি, ডেক্‌চি এবং টিফিন-ক্যারিয়ার প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এখন তো এই দেশেই এ্যালুমিনামের কারখানা খোলা হইয়াছে।

গত পঞ্চাশ বছরে এ্যালুমিনাম একটা যুগান্তর আনিয়াছে। এ্যালুমিনামের মত হাল্কা অথচ সুন্দর এবং সহজে নমনীয় ধাতু আর পাওয়া যায় নাই। ইহা অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে আবার বেশ শক্তও হয়। এ্যালুমিনামের রঙ্ রূপার মত, অথচ সহজে মরিচা পড়ে না। এরোপ্লেনের পাখা তৈয়ারী হইয়াছে এই এ্যালুমিনাম দিয়াই। ঘরের জানালার ফ্রেম, লাইফ বেল্ট তৈয়ারী হয় এ্যালুমিনাম দিয়া। কেবল বিজ্ঞান বা গৃহস্থালীর জিনিসের জন্যই যে এ্যালুমিনামের এত আদর তাহা নয়,

জুয়েলারী অর্থাৎ অলঙ্কারের দিক দিয়াও এ্যালুমিনাম কম সুশ্রী নয়। ছবিতে রিষ্টওয়াচ, ব্যাগ, নেক্‌লেশ, ব্রেস্‌লেট প্রভৃতি যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, উহার সমস্তই এ্যালুমিনামের তৈয়ারী। ঘড়িটির কাঁটা, মেইন স্প্রিং এবং হেয়ার স্প্রিং ছাড়া সবই



এ্যালুমিনাম দিয়া তৈয়ারী। সাধারণ ঘড়ির অর্ধেকেরও বেশী হাল্কা এই এ্যালুমিনাম ঘড়ি। নিকেল প্রভৃতি অন্যান্য ধাতুর ব্র্যাণ্ডে কখনও কখনও হাত চুলকায়; কিন্তু এ্যালুমিনামের ব্যাণ্ডে সেরূপ হয় না।

সম্পূর্ণ